ঋতুপর্ণ, রবীন্দ্রনাথ আর ছত্রিশ মাসে বছর

জহর সরকার

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮ই অগাস্ট, ২০১৩

আজ দূরদর্শনে রাত সাড়ে দশটায় ‘জীবনস্মৃতি: সিলেক্টেড মেমরিজ্’ দেখানো হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিষয়ে ঋতুপর্ণ ঘোষের তথ্যচিত্র। সর্বভারতীয় দর্শকদের জন্য তৈরি ছবি, তাই ইংরাজিতে — সত্যজিৎ রায়ের তথ্যচিত্রটির মতোই। ছবিটা যে অবশেষে দেখানো হবে, এটা প্রবল স্বস্তির খবর — কী অসম্ভব দেরি হল যদিও। ঋতুর সঙ্গে যত বারই কথা হয়েছে, মনে হত এই সরকারি দীর্ঘসূত্রতায় বড্ড হতাশ হয়ে পড়েছে। সরকারি কাজে এতটা দেরি কেন হয়, ও সেটা বুঝতেই পারত না। আজ ঋতু থাকলে খুশি হত। ওর জন্য অন্তত এইটুকু করা আমাদের কর্তব্যই ছিল।

২০১০ সালের গোড়ার দিকের কথা। দিল্লিতে আমার শাস্ত্রী ভবনের অফিসে দেখা করতে এল বুম্বা (অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়) আর ঋতু। তার বছর চারেক আগেই আমি কলকাতা ছেড়েছি, কিন্তু কলকাতা থেকে প্রায়ই অনেকে ফোন করেন, অনেকে দেখা করতে আসেন। তাঁদের দোষ দেওয়ার উপায় নেই — দিল্লিতে আর এমন ক’জন আমলাই বা আছেন যাঁদের কলকাতার সঙ্গে আত্মিক যোগ আছে। সেদিন ঋতুর সঙ্গে প্রায় তিন বছর পর দেখা হল। কিছুক্ষণ কথা চলার পর আমরা রবীন্দ্রনাথে পৌঁছলাম। আক্ষরিক অর্থেই। আমার অফিসে মহাত্মা গান্ধী আর রবীন্দ্রনাথের একটা ছবি রাখা আছে, আমরা সেই ছবির সামনে এসে বসলাম। দেখলাম, ঋতুর চোখ রবীন্দ্রনাথের দিকে স্থির হয়ে আছে, গান্ধীর দিকে কার্যত নজরই ফেরাল না সে। সেই ছবির সামনে বসেই ঋতু ওর ইচ্ছার কথা বলে। রবীন্দ্রনাথের ওপর একটি তথ্যচিত্র বানানোর ইচ্ছা।

সেই মিটিংয়ের পর কোনও এক সময় বুম্বা এই তথ্যচিত্রের পরিকল্পনা থেকে বেরিয়ে গেল। ঋতু কিন্তু লেগে রইল। রবিবাবুকে নিয়ে ঠিক কী করতে চায়, ঋতু নিজেও স্পষ্ট করে জানত না। আমি ওকে বললাম, যা-ই করার ইচেছ, তাড়াতাড়ি করতে হবে। যে সময়ের কথা বলছি, স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে তখন প্রথমবার কোনও প্রধানমন্ত্রী সংস্কৃতি মন্ত্রকের দায়িত্ব নিজের হাতে রেখেছিলেন। মনমোহন সিং প্রায় দেড় বছর এই মন্ত্রকের দায়িত্বে ছিলেন, এবং যে দুটো প্রকল্পের কথা তিনি আমায় বারে বারেই মনে করিয়ে দিতেন, তা হল রবীন্দ্রনাথ এবং বিবেকানন্দের জন্মের সার্ধশতবর্ষ। ২০১০ সালের ২০শে মে ন্যাশনাল কমিটির প্রথম বৈঠক হল। সনিয়া গান্ধী, প্রণব মুখোপাধ্যায় থেকে নরেন্দ্র মোদী, অনেকেই উপস্থিত ছিলেন সেই বৈঠকে। বৈঠকে উপস্থিত বেশির ভাগ সদস্যই একটা নতুন তথ্যচিত্র তৈরি না করার পক্ষেই ছিলেন — সত্যজিৎ রায়ের তৈরি ছবিটার কথা সবার মাথায় ছিল। শেষ পর্যন্ত স্থির হল, ন্যাশনাল ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটিই যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার, নেবে। তৎকালীন অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় ছিলেন এই কমিটির প্রধান। মূলত তাঁর আন্তরিক চেষ্টাতেই সার্ধশতবর্ষের অনুষ্ঠান এত বড় মাপে করা সম্ভব হয়েছিল।

দ্বিতীয় বৈঠকে তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঋতুপর্ণর প্রস্তাবের পক্ষে জোর সওয়াল করলেন। তথ্যচিত্র তৈরির আরও অনেকগুলি প্রস্তাব জমা পড়েছিল। আলোচনার পর স্থির হল, শ্যাম বেনেগালের নেতৃত্বে একটি প্যানেল তৈরি করা হবে। জমা পড়া প্রস্তাবগুলির মধ্যে সেরাটিকে বেছে দেবে প্যানেল। শেষ পর্যন্ত ঋতুর প্রস্তাবটিই মনোনীত হল। তখন ঋতু ছবিটার নাম দিয়েছিল ‘হোম অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড’। পরে দু’বার নাম বদলে শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল ‘সিলেক্টেড মেমরিজ্’। তবে, আমি যদি এত বছরে সরকারি দফতরের চালচলন

বিন্দুমাত্র বুঝে থাকি, তবে এই ছবির ফাইলের ওপর এখনও ‘হোম অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড’ লেখা আছে, অনন্তকাল থাকবেও।

ছবি মনোনীত হওয়ার পর, নেহরুর ভাষা ধার করে বললে, সরকারের সঙ্গে প্রচুর অভিসার আরম্ভ হল। এন.ডি.এফ.সি-র আমলাতন্ত্র আর পাঁচটা সরকারি প্রতিষ্ঠানের মতোই। ঋতু ছবি তৈরির অনুমতি পেয়েছিল এপ্রিলে। মে মাস শেষ হওয়ার আগেই তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। মাসাধিক কাল একটা অর্ডারের অপেক্ষায় বসে থাকার পর শেষে রীতিমত কড়া ইমেল চালাচালি আরম্ভ হল। এই দীর্ঘসূত্রতা অপরিচিত নয়। গোটা দুনিয়াতেই সরকারি কর্মীদের একটা স্পষ্ট প্রবণতা আছে — তাঁদের নিয়ম-বইয়ে নেই, এমন কোনও নতুন জিনিসের ক্ষেত্রে তাঁদের একটা মানসিক বাধা কাজ করে। তার ওপর, বছরের এই সময়টায় এন.ডি.এফ.সি-র সব শীর্ষকর্তাই কান-এ থাকেন, এটা তাঁদের প্রতি বছরের রুটিন।

শেষ পর্যন্ত অর্ডার বেরোল। জুলাইয়ের শেষে কাজ আরম্ভ করল ঋতু। আমায় বলল, বিশ্বভারতীতে শুটিং করার জন্য সুপারিশপত্র লিখে দিতে হবে। তারপর, লন্ডন এবং ইওরোপের আরও কয়েকটা জায়গায় শুটিং করার পরিকল্পনার কথা জানাল। আমরা লন্ডনে ভারতীয় মিশনের কাছে চিঠি লিখলাম। কিন্তু ঋতু নাছোড়বান্দা। আমি লন্ডনে ভারতীয় হাইকমিশনারের সঙ্গে কথা বলার পর ছাড়ল। কিন্তু লন্ডনে শুটিং করতে গেল না। কেন, কখনও বলেনি। তার পরের কয়েক মাসে ঋতুপর্ণর ফোন পেয়েছি মাঝেমধ্যেই — কখনও রিচার্ড অ্যাটেনবরো-র ‘গান্ধী’ ছবির ফুটেজের জন্য, কখনও সত্যজিৎ রায়ের ‘ঘরে বাইরে’-র ফুটেজ চেয়ে। আবার ইছামতীতে শুটিং করার জন্য বি.এস.এফ আর কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের অনুমতির ব্যবস্থা করে দেওয়ার অনুরোধ নিয়েও ফোন এসেছে। আমাদের দেশে কত কিছুর জন্য যে সরকারি অনুমতির প্রয়োজন হয়, ভাবলে আশ্চর্য লাগে।

২০১২ সালের ৩১শে জানুয়ারি ফের ঋতুর ফোন এল — আমাদের দফতর থেকে চিঠি পাঠানো সত্ত্বেও বিশ্বভারতীতে শুটিং করতে দেওয়া হচেছ না তাকে। যে অফিসারের অনুমতি লাগবে, তিনি ছুটিতে, ফিরবেন ১২ই ফেব্রুয়ারি। ঋতু স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন। শুটিংয়ের অনুমতি না পাওয়া মানে বিপুল অপচয় — সময়, টাকা, উদ্যোগ সব নষ্ট। শেষ পর্যন্ত বিশ্বভারতীর রেজিস্ট্রার উদ্ধার করলেন। মার্চেই আবার ঋতু যোগাযোগ করল। শিমলায় ভাইসরয়ের থাকার এক বাংলো চোখে পড়েছে তার, সেখানে শুটিং করবে। আমি তত দিনে সংস্কৃতি মন্ত্রক থেকে বদলি হয়ে গিয়েছি, কিন্তু ঋতু নাছোড় কেন্দ্রীয় সরকারের যে প্রতিষ্ঠানটি এখন শিমলার সেই বাংলোয় চলে, তার কর্তৃপক্ষের থেকে, কেন্দ্রের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক থেকে এবং আর্কিয়োলজিক্যাল সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়া থেকে অনুমতি জোগাড় করে দিতে হবে। সবার সঙ্গেই কথা বললাম। কিন্তু তার পর ঋতুর সহকারী জানালেন, শিমলায় শুটিং করার পরিকল্পনা বাতিল করে দিয়েছে সে।

কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের কাছে বকেয়া টাকা আদায়ের জন্য ঋতুকে কী পরিমাণ দৌড়তে হয়েছে, আমি জানি। সরকারি ক্যালেন্ডারে মার্চ মাসটা ভয়াবহ। আর্থিক বছরের শেষ মাস, অফিসের বাইরে পাওনাদারের লাইন পড়ে যায়। জয়েন্ট সেক্রেটারি ঋতুর ব্যাপারটা খানিক দেখলেন বটে, কিন্তু জানিয়েও দিলেন, মন্ত্রকের হাওয়া বদলেছে। মন্ত্রী বদল হয়েছে, ফলে কোন্ বিষয়টা বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর কোনটা কম, সেই হিসেবও বদলেছে। রবীন্দ্রনাথ আর বিবেকানন্দ নিয়ে ‘বাড়াবাড়ি’ বন্ধ হওয়ায় অনেক অফিসারই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। সার্ধশতবার্ষিকী সংক্রান্ত বেশ কিছু প্রকল্প বন্ধও হয়ে গিয়েছে। ঋতুপর্ণর তথ্যচিত্র বন্ধ হল না বটে, কিন্তু ছবিটির মুক্তির ব্যবস্থা করা যাঁদের দায়িত্ব ছিল, তাঁরা ভুলেই গেলেন। মুম্বইয়ের এন.ডি.এফ.সি অফিসে এক বছর পড়ে থাকল ছবিটি।

গত জুলাই থেকে এ বছর মে পর্যন্ত ঋতুপর্ণর সঙ্গে বেশ কয়েক বার কথা হয়েছিল। প্রতিবারই ও তথ্যচিত্রটির কথা মনে করিয়ে দিত। আমি সংস্কৃতি মন্ত্রকের কাউকে কাউকে বলেছিলামও, কিন্তু কিছুই হল না। তারপর ঋতু হঠাৎই চলে গেল। সেই রাত্রে আমরা কয়েকজন শপথ নিয়েছিলাম, যে ভাবে হোক, ছবিটা দেখাতেই হবে। কিছুদিন পরেই মন্ত্রকে সচিব হয়ে এলেন রবীন্দ্র সিং। সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ, আমার পুরোনো বন্ধুও বটে। তিনি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। এ বার সত্যিই কাজ এগোল। মন্ত্রক এন.ডি.এফ.সি-কে জানাল, তথ্যচিত্রটিকে সেন্সর সার্টিফিকেটের জন্য পাঠানো হোক। ছাড়পত্র পেতে সামান্যই সময় লাগল। এই কাজটাই যদি আর ক'দিন আগে হতো, ঋতু দেখে যেতে পারত।

আমি ঋতুকে বেশ কয়েক বার বলেছিলাম, তোমার ছবিটা রিলিজ করলেই কিন্তু লোকে সত্যজিৎ রায়ের তথ্যচিত্রের সঙ্গে তুলনা আরম্ভ করবে। প্রতি বারই ঋতু গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে জানিয়েছিল, তার ছবিতে সে রবীন্দ্রনাথকে একেবারে অন্য জায়গা থেকে দেখেছে, নতুন ভাবে পড়েছে। ঋতু আমায় তথ্যচিত্রটির ডি.ভি.ডি পাঠিয়েছিল, এবং যতদিন না আমি ছবিটা দেখেছি, ততদিন তাড়া দিয়ে গিয়েছিল। আমি ছবিটা দেখে প্রথমে একটু ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। তার পর, মুগ্ধ হলাম। সাধারণত তথ্যচিত্রে একটা সরলরৈখিক গল্প বলার ধারা আছে। ঋতু সেই ধারাকে আশ্চর্য ভাবে ভেঙেছে। সময়ের ধারাবাহিকতা বজায় আছে সেখানে, কিন্তু তার মধ্যে ঢুকে পড়েছে কবিতা পাঠ, গান বা আরও অপরিচিত সব যতিচিহ্ন। এই ছবিতে যে ভাবে তার নিজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের কথা তুলে এনেছে, সে রকম খুব কম পরিচালকই করতে সাহস পাবেন। এই কারণেই ঋতু শেষ পর্যন্ত ছবিটার নাম দিয়েছিল 'সিলেক্টেড মেমরিজ্'। এটা রবীন্দ্রনাথের পুরো জীবনের ধারাবাহিক গল্প নয়।

এই ছবির প্রসঙ্গক্রমে সত্যজিৎ রায়ের তথ্যচিত্রটির কথা আসবেই। সেখানে পরিচালকের ব্যারিটোন কণ্ঠ রবীন্দ্রনাথের জীবনের এক একটা অধ্যায় ছুঁয়ে যাচ্ছিল। আবেগের স্পর্শ চোখ এড়ানোর নয়। সত্যজিতের ছবিটি নিঃসন্দেহে কালজয়ী, কিন্তু সেই ছবি পরিচালকের দিক থেকে নৈর্ব্যক্তিক — সত্যজিতের পরিবারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা বা ব্রাহ্ম সমাজের জড়িত থাকার কথা নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া আসেনি একবারও। ঋতুপর্ণর ছবি এখানে আলাদা। সে বারে বারেই ছবির ফ্রেমে ঢুকে পড়েছে, বেরিয়ে গিয়েছে, স্থানকালের সীমা ভেঙে দিয়েছে অনেকখানি। সেটা কেমন হল, দর্শক বিচার করবেন।

হঠাৎই একটা কথা মনে হল। রবীন্দ্রনাথ চলে গিয়েছেন ৭২ বছর আগে। ১৯৯২ সালে সত্যজিৎ রায়ও পাড়ি দিয়েছেন। আড়াই মাস আগে চলে গেলেন ঋতুপর্ণ ঘোষও। আচ্ছা, সেই অন্য দুনিয়ায় কি এই তিন জনের দেখা হয়েছে? সেখানে বসে তাঁরা কি সেরে নিচেছন তাঁদের অসমাপ্ত আলোচনা?